International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-IV, July 2023, Page No.43-52
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i4.2023.43-52

আশাপূর্ণার ছোটগল্প: নীরব প্রতিবাদের সরব কাহিনি

ড. তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Ashapurna Devi's short stories explore the inner world of women's lives. She is a skillful artist in depicting women's responsibilities-duties, success-failure, pain-disappointment, humiliation-deprivation, restrictions, obstacles etc. in the family. As a woman, what she has seen in society and family life is reflected in her short stories. The whole story of silent protest is depicted in his short stories. She wrote about the middle class domestic people. She did not write based on hearsay and text. The unknown story of the known people of the known world as reflected in her story. She has protested in the face of female characters like housewife, widow, maid servant, old woman, conservative woman, warrior woman etc. She did not have to create this language. The language in which women protest in family and social life is the language she has given shape to the story. However, she does not develop women as completely averse to the family and rebels. She created the language of women's protest in short words and sweet words. The state of mind of lower middle class and middle class woman has not been properly reflected in the writings of male writers so far but Ashapurna Devi's short story fills that gap. That is why Ashapurna Devi is called the rebellious woman of damp undivided India. How the multifaceted voice of women's protest is reflected in the story of Ashapurna Devi will be highlighted in the research paper.
Key words: women's protest, women's lives, silent protest, middle class, dignity.

মূল প্রবন্ধ: আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ চিত্তে নবনীতা দেবসেন বলেছেন 'অসামান্য ব্যক্তি' (বসু, ২০০৯, পৃ. ৩০) লেখার বৃত্তে নারীজীবনের কাহিনি আবর্তিত হওয়ায় তাঁকে নারীবাদি লেখিকা বলা হয়। সংসার জীবনের খুঁটিনাটি দিক সুনিপুণ রেখায় চিত্রাঙ্কনের জন্য তাঁকে ঘরকন্নার লিখিয়ে বলা হয়। আশাপূর্ণা দেবী সম্পর্কে এই সব অভিধা প্রমাণ করে যে, বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী নারীর কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন। কথাসাহিত্যের ছোটগল্প শিল্পপ্রকরণটি লেখিকার কাছে ছিল আশা, স্বপ্ন, প্রথম প্রেম ও ভালোবাসার ধন। তাঁর কাছে উপন্যাস লেখা ছিল বড় মাপের কাজ এবং ছোটগল্প লেখা ছিল মন ও হৃদয়কে আনন্দ প্রদান করা। ''নারীজীবনের যে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নির্মাণ করেছেন আশাপূর্ণা, তাতে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-নিরাশা-অভিমান-স্নেহ-মমতা — পুরুষতন্ত্রের চোখে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মেয়েজীবনের এই অনুভূতিগুলো কী নিবিড় হয়েই না অবারিত হয়েছে। অন্তঃপুর যে মেয়েদের শক্তিকে কতখানি ব্যবহার করে,

দমন করে, শোষণ করে, স্বীকার করে, লুপ্ত করে — তারই এক বিশ্বস্ত খতিয়ান আশাপূর্ণার গল্পমালা।'' (চক্রবর্তী, ২০০৯, পৃ. ৭০)

'আশাপূর্ণার ছোটগল্প: নীরব প্রতিবাদের সরব কাহিনি' হলেও লেখিকার জীবন কাহিনি স্বল্প পরিসরে জানা প্রয়োজন। কারণ তিনিও জীবনে অনেক কিছু সয়েছেন এবং লেখনীতে গল্প-উপন্যাসে নারী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে সরবে প্রতিবাদ করেছেন।

আশাপূর্ণা স্বভাবে দুরন্ত, ডানপিটে ও 'ছিষ্টিছাড়া' হলেও বাধ্য মেয়ে ছিলেন। ছোটবেলায় দাদাদের সঙ্গে ঘুড়ি উড়িয়ে, মারবেল, ক্যারাম খেলে সময় কাটিয়েছেন। সেকালে মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর রেওয়াজ ছিল না, ঠাকুমাকে বলতে শুনেছেন, 'স্কুলে গেলেই মেয়েরা ফ্যাশানি আর বেচাল হয়ে উঠবে।' (বসু মিশ্র, ২০০৯, পৃ. ১৯) তাই তিনি প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পাননি। তবে পড়াশুনা করতেন না এমন নয়, বরং বেশিই করতেন। পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে যেমন বিদ্যার্জনের জন্য স্কুলে যেতে পারেননি, তেমনি পারিবারিক কারণেই সাহিত্য পাঠের এক বিরাট পরিমণ্ডল পেয়েছিলেন। তাঁর মা সরলাসুন্দরী ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক, বাবা হরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেকালের নামকরা আর্টিস্ট। 'ভারতবর্ষ', 'মানসী' পত্রিকার জন্য নিয়মিত ছবি আঁকতেন তিনি। বাড়িতে বঙ্কিম, শরৎ ও রবীন্দ্রনাথ সহ বিখ্যাত লেখকের গ্রন্থের অভাব ছিল না। 'সাধনা', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী' ইত্যাদি সহ অনেক পত্রিকা তাদের বাড়িতে নেওয়া হত। এইরকম পরিমণ্ডলে তিনি বড় হয়েছেন। প্রথাগত শিক্ষার নির্দিষ্ট পাঠক্রম ছিল না, মেয়ে বলে ইচ্ছামত বাইরে যাবার সুযোগ ছিল না— এই বিষয়গুলো আশাপূর্ণার জীবনে 'সাপে বর' হয়ে উঠেছিল। গৃহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরণের বই পড়ার স্বাধীনতা ছিল অবাধ, অনুভবী হৃদয় দিয়ে বই পড়েছেন, কল্পনার ডানা উড়িয়েছেন, পারিবারিক পরিমণ্ডলের যাবতীয় উপাদান-উপকরণ মনের মধ্যে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন — যেগুলিকে তিনি পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনার রসদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অনুভবী মন, সংবেদনশীল হৃদয় ও সাহিত্য পাঠের নেশাই তাঁকে কল্পনাচারী হতে শিখিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে রক্ষণশীলতার গন্ডীতে কিন্তু আসলে সেই সময়টা ছিল তাঁর প্রথাবিরুদ্ধ সাহিত্য পাঠের অনাবিল জগৎ। আবার স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখতে না পারা প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''কিন্তু ইস্কুল কলেজে পড়লে আমি অন্তত এতদিনে বিদূষী হয়ে যেতাম। কত বিষয় পড়তে পারতাম, জানতে পারতাম। অভিজ্ঞতার ঝুলি এত ফাঁকা থাকত না। এই দুঃখ ঘোচবার নয়। এই শূণ্যতা তোমরা বুঝবে না।'' (দাশ, ২০০৯, পৃ. ২২৯)

মেয়ে ও বৌমা হিসাবে তাকে বেশ কিছু বিধি-নিষেধের মধ্যে চলতে হয়েছে। যেমন - মেয়ে বলে স্কুলে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, বৌমা হিসাবে কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন পঞ্জিকা-পাঁচালী ছাড়া অন্য গ্রন্থ পাঠ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং লেখিকা জীবনের প্রথম পর্বে বড়দের জন্য লিখতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। সাংসারিক কর্ম-সম্পাদনের জন্য দিনের বেলায় লেখার সুযোগ প্রায় পেতেন না, রাত্রিবেলায় বাড়ির সব কাজ সেরে তবে লেখায় মনোনিবেশ করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''সব কাজকর্ম সেরে, ... তাদের খুশি করেই তবেই না ছিলো কলম ধরার সময়। তা দিনের বেলা আর কোথায় হতো, লিখতুম তো রাত্তিরে। পরে কলকাতায় বাসা করার পরও সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু লেখার সময় গুছিয়ে নেওয়া, আর রাত জাগা। নিজের জন্যে ছিলো ওইটুকুই অবসর। একেক দিন এমন হতো, সারারাত লিখতে লিখতে ভোর হয়ে যেতো, তারপর কর্পোরেশনের কলের জল পড়ার শব্দ শুনে কলম বন্ধ

করতুম। আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে ফের সংসারের চাকার হাল ধরা।'' (বসু মিশ্র, ২০০৯, পৃ. ২০) লেখিকা জীবনের চাপা পড়া বেদনার নীরব কাহিনির প্রতিফলন তাঁর গল্পে পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি অন্তরের তাগিদে লিখতেন। তবে বলতেন, পত্রপত্রিকার তাগাদাই তাকে লিখতে উৎসাহ দিয়েছে। উৎসাহ পেয়েছেন স্বামীর কাছ থেকেও। লেখার কাজে স্ত্রীকে উৎসাহ প্রদান, পত্রিকা দপ্তরে লেখা পৌঁছে দেওয়া, বাড়িতে লেখিকা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসা অতিথিদের আপ্যায়ণ করা, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাহিত্য সভায় যাওয়া, স্ত্রীর লেখা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বামীর কাছ থেকে অনেক সমর্থন পেয়েছিলেন।

তেরো বছর বয়স থেকে লেখা শুরু করলেও পাঠক সমাজ আশাপূর্ণা দেবীকে বিশেষভাবে চিনতেন না। কেউ কেউ ভাবতেন 'আশাপূর্ণা দেবী' হয়তো কোনো ছদ্মনাম। তিনিও সভা-সমিতি-অধিবেশন বা সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ করতেন না। ১৯৫১ সালে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নরেন্দ্র দেবের আহ্বানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় প্রথম গিয়েছিলেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সভায় যেতে শুরু করলেন এবং সমকালীন লেখকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে লাগলেন।

'শিশুসাথী' পত্রিকা তাঁর ব্যক্তিগত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের সাহিত্য পাঠের সঙ্গে কল্পনাবিলাসী প্রতিভার সংযোগ ঘটিয়ে ছিল। ১৯২২ সালে সবার অলক্ষ্যে প্রকাশিত হল 'বাইরের ডাক' কবিতাটি। ঐ পত্রিকাতেই ছাপা হল প্রথম গল্প 'পাশাপাশি'। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার সূত্র ধরেই অন্য পত্রিকাতে লেখার সুযোগ পেলেন। 'খোকাখুকু', 'রংমশাল', 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকায় শিশুসাহিত্য প্রকাশিত হতে থাকল। লেখালেখি জীবনের প্রথম পর্বে ছোটদের জন্যই লিখে গেছেন।

১৯২৪ সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে কৃষ্ণনগর নিবাসী কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। রক্ষণশীল শাশুড়ী সরোজিনী দেবী চাইতেন বউমা শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়ুক এবং ধর্মে মতি হোক। এই জন্য তিনি ছেলে ও বৌমাকে স্বামী পূর্ণানন্দের কাছে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে কলকাতার ভবানীপুরে চলে আসার পর আবার লেখালেখি শুরু করলেন। তবে গুরুজন ব্যক্তিদের ভয়ে এই পর্বে বড়দের জন্য না লিখে ছোটদের জন্যই লিখে গেছেন। বিয়ের বারো বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে বড়দের জন্য প্রথম লিখলেন 'পত্নী ও প্রেয়সী' গল্পটি। ১৯৪৪ সালে প্রথম উপন্যাস লিখলেন 'প্রেম ও প্রয়োজন'। এরপর আর লেখার কলম থেমে থাকেনি, মৃত্যুর দু-তিনমাস আগে পর্যন্ত লিখে গেছেন তিনি।

আশাপূর্ণার চেনা জগৎ হল সাংসারিক প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জীবনযাত্রা। তিনি সমাজ ও সংসারে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। কিন্তু তিনি আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেখেননি — মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে, সর্বোপরি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। সাধারণ নিছক গল্প বলার জন্য গল্প লেখেননি, গল্পের মধ্যে কোন না কোন Message দিয়েছেন। প্রতিবাদী মন নিয়ে গল্পের চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন।

মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষের কথাই তিনি লিখেছেন। শ্রুতির উপর নির্ভর করে নয়, পাঠলব্ধ বিষয়ের উপরে নয়; জানা জগতের চেনা মানুষের গল্প, চেনা মানুষের অচেনা রূপ — যা তথাকথিত চাকচিক্যময় পোষাকের অন্তরালে চাপা পড়ে থাকে, সেই মনোজগতের কথাই তিনি সহজসরলভাবে তুলে ধরেছেন। চরিত্রে Idealism নেই, আছে আন্তরিক এক বাস্তব সত্যতা। নারীরা অন্দর মহলের রানী হলেও পুরুষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েন, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি মেটাতে গিয়ে বিরূপ হাওয়ার

মুখোমুখি হন। সাংসারিক এই টানাপোড়েনের হাওয়াতে কোন নারী জীবনতরী ভাসান, কেউবা বিরূপ স্রোতে এগিয়ে চলেন। নারীর বহুমুখী পথ চলার ইতিহাস আশাপূর্ণার জানা ছিল। জীবন দিয়ে সেই সত্য উপলব্ধি করে লেখিকা বলেছেন, ''বাল্যে থেকে বার্ধ্যক্যে দীর্ঘকাল ধরে লিখে চলেছি। এই দীর্ঘকাল যেমন ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে তেমনি সমাজজীবনের ওপর দিয়েও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা, রদবদলের ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। লেখা কোনদিনই থামাইনি। সমাজের বদল ঘটেছে, বদল ঘটেছে সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিকতারও। লেখার মধ্যে সেই বদলের ছাপ এসেছে অনিবার্যভাবেই। তাই অনেক সময় মনে হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে স্ব-বিরোধিতা। কিন্তু যা দেখেছি আর দেখে যা মনে হয়েছে সেটাই লিখে চলেছি।'' (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৯, পৃ. ১৩)

পারিবারিক পরিমণ্ডলে শৈশব কৈশোর জীবন, সাংসারিক পরিমণ্ডলে লেখালেখির বিধি-নিষেধের মধ্যে এবং লেখিকা সত্তার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে নিহিত আছে আশাপূর্ণার নীরব প্রতিবাদের নির্লিপ্ত বেদনা। এবার বেশ কিছু গল্পের অন্দরমহলের মধ্যে নারীর নীরব প্রতিবাদের সরব কাহিনি অনুসন্ধান করা যাক।

'উদ্বাস্তু' গল্পে দেশ, স্বজন ও ভিটেমাটি ছাড়ার কাহিনির অন্তরালে নারী-বেদনার এক নির্মম কথাও আছে। দৈহিক ও মানসিকভাবে নারীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল তা দেশ হারানোর বেদনার থেকেও মর্মান্তিক। সেই আত্মিক যন্ত্রণায় চাপা পড়া কথা আশাপূর্ণা তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'ইজ্জত' গল্পের কাহিনি সকলের চেনা কিন্তু বস্তির মা, মেয়ে ও গৃহস্থ ঘরের গৃহিনীর সরব ও নীরব প্রতিবাদ কি আমাদের চেনা? বস্তির মেয়েটির সুরক্ষার কথা ভেবে মধ্যবিত্তের স্ত্রী সুমিত্রা কথা দিলেও তার স্বামী রাজী হয়নি। ফলে সুমিত্রার কথা দিয়ে কথা না রাখার কারণে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। তিনি গৃহিণী হয়ে সংসারের জন্য সব করতে পারেন কিন্তু একক সিদ্ধান্ত নিয়ে অসহায়া নারীর পাশে দাঁড়াতে পারেন না। আশ্রয়প্রার্থিনী মেয়েটিও প্রতিবাদ করে বলে 'বাবুদের কাছে ছোটলোকের মেয়ের ইজ্জতের কোন দাম নেই। .... মন্দ হতে হয়, মন্দই হব।' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ৭) স্বল্প কথায় মার্জিত ভাষায় বস্তির মেয়ের মুখ দিয়ে লেখিকা প্রতিবাদ করলেন। বাড়ির কর্তী, বস্তির মেয়ে ও মা — তিনজন নারীই তথাকথিত ভদ্র সমাজের কাছে অসহায়া। এই নগ্ন সত্য উদ্ঘাটনই লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল। 'রাজুর মা' গল্পেও অসহায়া ও নির্যাতিতা মেয়ের কথাই লেখিকা সহৃদয় নিয়ে সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'আবেদন' গল্পে রাধারানীর বৈধব্য জীবন বর্ণনাই শেষ কথা নয়। তেরো বছর বয়সে বিধবা হলে মেয়েদের জীবন কেমন অন্ধকারে চলে যায়, কেমন করে বাপের বাড়ির গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়, জীবনের সব রঙ কেমন করে ফিকে হয়ে যায় সেই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সেখান থেকে ছাব্বিশ বছর বয়সি দূর সম্পর্কের দেওরের পত্রে সাড়া দেয় চিরক্ষুধার্ত রাধা। সমাজের তৈরী করে দেওয়া বাল-বিধবাদের নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে রাধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। বালিকা বধূর অসহায়তা নিয়ে অনেক গল্প আছে কিন্তু তাদের সুপ্ত ইচ্ছা জেনে জীবনে বাঁচার প্লাটফর্মের সন্ধান ক'জন গল্পকার দিতে পারেন ?

ছেলে চুরি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ছুটি নাকচ' গল্পটি। কাজের মেয়ে মালতী মালিকের বাড়ির মেয়েকে শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচার থেকে বাঁচাতে ছেলে চুরি করে এনে দেয় তাকে। বিচারে তার জেল হয়। জেল খেটে ফিরে মালতী স্বামী ও সন্তানকে খুঁজতে থাকে। তাকে এই কাজে সাহায্য করে আর এক জেল ফেরৎ আসামী নিকুঞ্জ। ছেলে চুরি থেকে অর্জিত অর্থ স্বামীর কাছেই মালতী রেখে যায়। ভেবেছিল সাজা শেষ হবার পর আবার স্বামীর সঙ্গে সংসার শুরু করবে। খারাপ কাজ থেকে স্ত্রীর অর্জিত অর্থ স্বামী ভোগ করে

কিন্তু তার জন্য পড়ে থাকে কলঙ্ক, অপমান ও ঘৃণা। ফলে সংসারে ফেরার স্বপ্ন ভেঙে যায়। তখন নিকুঞ্জের সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরু করে মালতী। স্বামী ও সমাজের স্বরূপ নীরবে উন্মোচন করে মালতীর জন্য নতুন পথের সন্ধান দিয়ে গল্পকার বার্তা দিলেন যে, নারীকে নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। থেমে থাকা নয়, মেয়েরাও নতুন করে শুরু করতে পারে। মালতীর প্রতি স্বামীর অবজ্ঞা ও অবিচার গল্পের শেষ কথা নয়, স্বামী ফিরিয়ে নিল না বলে তার জন্য হতাশ হয়ে অশ্রুপাত নয়, বরং জেল ফেরৎ নিকুঞ্জর সঙ্গে নতুন জীবনের সন্ধান করে নেবার মধ্যেই আছে প্রতিবাদ। এই দিকের ইঙ্গিত দেবার জন্যই 'ছুটি নাকচ' গল্পের অবতারণা।

'শুধু একটি ঠিকানা' গল্পে ভাই-বোনের কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়েছে। এক অচেনা মানুষ যার ছেলে যুদ্ধে নিহত, সে আশ্রয়হীন, সরকারের কাছে আবেদন করলে ভাতা পেতে পারে অথচ তার আশ্রয় নেই এবং আবেদন করার পদ্ধতি জানা নেই ও বিদ্যাও নেই। কেউ তার মনের অবস্থা বুঝতে চায় না। সুলতা এই মানুষটিকে সাহায্য করার জন্য তার দাদা অসিতকে বলে কিন্তু দাদা বোনের কথায় কোন কর্ণপাত করেন না। সুলতা বলে, 'মেয়েদের তো দয়া করবারও অধিকার নেই'। (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ১১৪) এই কথায় সচেতন পাঠক চমকিত হয়। মেয়েদেরও যে মন আছে, অন্যের দুঃখ বুঝতে পারে এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আছে অথচ বাইরের মানুষকে সাহায্য করতে হলে কোন না কোন পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কেন? এজন্যই সুলতার দয়া করবার অধিকার অর্জনের প্রশ্ন উঠেছে। ছোট্ট একটি কথা কিন্তু গল্পে তার আবেদন অধিকার নিয়ে, নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নিয়ে। অবিবাহিতা বোনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অধিকার-অনধিকার নিয়ে স্বল্প বাক্যে বৃহৎ সামাজিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হল সুলতার মধ্য দিয়ে। কার ঠিকানার দরকার? অসহায়ভাবে রাস্তায় ঘোরা মানুষটির, না স্বাধীনভাবে কিছু করতে না পারা অবিবাহিতা তরুণী সুলতার?

'ছিন্নমস্তা' গল্পে জননী চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা তুলে ধরা হয়েছে। সন্তান ও স্বামীকে ঘিরেই নারীর আশা, ভালোবাসা ও স্বপ্নের জগৎ তৈরী হয়। স্বামী হারা প্রৌঢ়া নিজ সন্তানকে অবলম্বন করে একাকীত্ব দূর করতে চায় কিন্তু সন্তানের জীবনে পুত্রবধূর আধিপত্য মেনে নিতে পারে না। বৌমার সঙ্গে শাশুড়ির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পুত্রের মৃত্যু ঘটে। মাতৃ চরিত্রের একাকিত্ব, পুত্রের উপর অধিকারহীনতা ও বৌমার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার পরিণাম দেখানো হয়েছে গল্পে। নারী মনস্তত্ত্বের দিকই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে আশাপূর্ণা ঠোঁটকাটা ছিলেন না। সংসার জীবনে সর্বংসহা রূপে কাটিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবাদ করেছেন লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর লেখনীর গভীরতায় নারী প্রতিবাদের দুটি স্রোত — উচ্চভাষী ও মৃদুভাষী। যেমন 'দেশলাই বাক্স' গল্পে পাঠক ডুবে থাকে গ্র্যাজুয়েট বেকার সমীর এবং 'ক্যালাস' কেরানির কাহিনিতে। চিরকেরানি অনাদিপ্রসাদ বিধবা মেয়ের কথা ভেবে মনে মনে বলে, '... সেখানে তোমার ভাসুর-দেওর বিরাট একান্নবর্তী পরিবার, পড়ে থাকলে নিশ্চিত অন্ন ছিল। তুমি থাকলে না পড়ে, আমার অন্নে ভাগ বসাতে এলে। এসো, আমি কিছু আপত্তি করি নি, তবু তুমি রাত-দিন নাগিনীর মতো ফুঁসে বেড়াচ্ছো। তোমার ও জ্বালার ওষুধ আর আমি কোথায় পাবো ?'' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ২২১) বিয়ের পর বিধবা মেয়ের দায়ভার বাবাও নিতে চায় না। বোন, দিদি, মেয়েকে সবাই ভালবাসে কিন্তু বিধবা মেয়ে বাপের কাছে ফিরে এলে বাপের বাড়ির চরিত্রগুলো রাতারাতি পাল্টে যায়। সম্পর্কগুলো স্নেহ-মমতার পরিবর্তে নিমপাতা হয়ে ওঠে। সংসারে জাঁকিয়ে বসে ছড়ি ঘোরানো বিধবা মেয়ের নীরব প্রতিবাদের অনুচ্চ কাহিনি গল্পে আছে। সাধারণত

বিধবা মেয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলে সকলের অবজ্ঞার পাত্রী হয়েই থাকে কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী তাকে বাবার বাড়ীতে দাপুটে ভূমিকায় রেখে বার্তা দিলেন যে, বাড়ীটা তার 'বাবার'।

'নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য' গল্পে তিরাশি বছরের সদ্য বিধবা হেমাঙ্গিনীও নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ছিয়ানব্বই বছরে নিবারণবাবু মারা যাবার পর পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি-নাতনীরা এসে হইহই করে শ্রাদ্ধ উৎসবে মেতে ওঠে। মৃত ব্যক্তি স্কচ হুইস্কি খেতেন বলে সেসব আনারও ব্যবস্থা হয়। সেই সময় 'কঙ্কালসার প্রেতাত্মা' রূপী বিধবা হেমাঙ্গিনী জানান তাদের পিতা আঙুর পছন্দ করতেন। তাই যদি মিষ্টি আঙুর একটু আনানো যায়। কারণ শেষ বেলায় চাকরকে দিয়ে আনা আঙুর টক বলে তাদের বাবা না খেয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ছেলেদের উদ্ব্যাস্ত করতে 'লজ্জা' লাগবে বলে তিনি আগে বলেন নি। এই কথায় উপস্থিত শ্রোতারা বলে ওঠে, লজ্জার কথাটা বলাটাই তো লজ্জার। এরপর হেমাঙ্গিনী হঠাৎই বেসুরো গলায় আক্রমণের সুরে বলে ওঠেন, 'কি আশ্চর্য! তোদেরও তাই মনে হতো ? আমিও যে ভাবছি ওই কথা —' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ১৫) অনুচ্চ কথায় অত্যুচ্চ প্রতিবাদ এইভাবে আশাপূর্ণার সৃষ্ট নারী চরিত্রে দেখা যায়।

'ক্যাকটাস' গল্পে বাড়িওয়ালীর ব্যবহারের তিক্ততায় অসহযোগিতায় অধ্যাপিকা ভারতী ও তার স্বামী শিশির অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পাঠকও ধরেই নিয়েছেন ভাড়াটে বনাম বাড়িওয়ালীর দ্বন্দ্ব নিয়েই গল্প। দু-পৃষ্ঠা ব্যাপী গল্পের বিন্যাসের পরই হঠাৎ এসে পড়ে নারী স্তুতির মধ্যে 'নারীভাবনার' প্রসঙ্গ। ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে বাড়িওয়ালীর মুখে ভারতীর প্রশংসা, ''তোমরাই ধন্য মেয়ে বৌমা! একালের মেয়েরা! এই সংসারের ছিষ্টি করছো, রাঁধছো বাড়ছো আবার মোটা টাকা ঘরে আনছো!'' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ৯২) এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বিতায় অপর নারীর তৃপ্তি। কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্স অন্যত্র। ভারতী কলেজের গার্লস হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্বের সুবাদে উচ্চমানের কোয়ার্টার পেতে চলেছে। স্বামীর কাছে এই প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে উত্থাপন করে ভারতী চমকে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু স্ত্রীর পাওয়া কোয়ার্টারে স্বামীর যেতে পৌরুষত্বে বাঁধল। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী বনে, অরণ্যে, পাতালে, পর্বত শিখরে সর্বত্র থাকতে গর্ববোধ করে কিন্তু স্ত্রীর 'ভাগ্যলব্ধ' বাসায় বাস করতে স্বামীর আত্মসম্মানে লাগে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীর ভাবনায় ধরা পড়ে যুগান্তরী নারী প্রতিবাদের তীব্র শ্লেষ, ''সেই চিরন্তন পুরুষ জাতির অর্থহীন অহমিকা! কিছুতেই নিজেদেরকে স্ত্রীর থেকে উচ্চস্তরের না ভেবে ছাড়ছে না। উচ্চস্তরের, উচ্চদরের, উচ্চমর্যাদার! আরে বাপু, যেকালে দশ বছরের মেয়েগুলোকে এনে নিজেদের সংসার গারদে প্রায় ক্রীতদাসীর মতোই জন্মের শোধ পুরে ফেলতিস, সেকালের চিন্তা-চেতনা-অভ্যাসটা ভুলতে পারছিস না কেন তোরা?

স্বামী, প্রভু, বর ইত্যাদি করে 'শ্রেষ্ঠাত্মক' শব্দগুলো নিজেদের নামের সঙ্গে জুড়ে রেখে করলি তো এতদিন অনেক রাজ্যপাট, এবার সেই কৃত্রিম মোহভঙ্গ হোক না। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেখ না একবার 'বর বড় না কনে বড়।' অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কি স্ত্রী পুরুষ দুজনে একই সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসেনি?'' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ৯৬) ভারতী স্বামীকে 'নকল প্রেসটিজের মিনার' থেকে নামিয়ে আনতে চায়। মনে মনে বলে, 'ও তুমি পুরুষ বলে একেবারে রাজা হয়ে গেছ!' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ৯৭) এই সব ভাবনা চিন্তা করতে করতে ভারতী বলেই বসে, 'কাজটা আমি নেবই। ... আমি আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি।' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ৯৯) এরপর ভারতী ছেলেকে নিয়ে কোয়ার্টারে স্থানান্তরিত হয়। গল্পে স্বাধীনচেতা নারীর প্রতিবাদই বড় হয়ে উঠেছে। অধ্যাপিকা হয়ে কেরানী স্বামীর রোজগারকে সম্মান করে সংসারের জন্য আপ্রাণ কাজ করেও নিজস্ব যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে যদি ভারতীর মত স্ত্রী না পারে তাহলে সেই স্বামীর সঙ্গে না

থাকাই ভাল৷ সন্তানের হিতসাধনের জন্য সপ্তাহান্তে দেখা করার সৌজন্যটুকু থাকে থাকুক কিন্তু নারীকে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করার অধিকার থেকে যেন কেউ বঞ্চিত করতে না পারে৷ মেয়েদেরও যে সংসার নিয়ে আশা-স্বপ্ন-ভালবাসা আছে তাকেও পুরুষ সমাজ মর্যাদা দিক৷ গল্পকার যতই বলুক না কেন 'ওই সব ছাইপাঁশ চিন্তা মনে এসে যাচ্ছে বেচারা ভারতীর'৷ (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ৯৯) আসলে এইভাবে আশাপূর্ণা গল্পে নারীকে প্রতিবাদী করেছেন৷ ''আশাপূর্ণার কথাসাহিত্যে প্রতিবাদ একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য৷ কিন্তু সে প্রতিবাদ সশব্দ নয়, তোলপাড় নেই তাতে, ভাঙচুর নেই কিন্তু ফল্গুধারার মত স্রোত আছে তার৷ আশাপূর্ণা এই প্রতিবাদের ভাষা অর্জন করেছিলেন নিজের জীবন থেকে৷ ... তাঁর নীরব প্রতিবাদ৷ ... সাংসারিক জীবনের যে দায়দায়িত্ব মেয়েদের নিতে হয় তাকে তিনি অস্বীকার করে ধ্বংসের নীতিকে গ্রহণ করেননি কোনদিন, তিনি সমাজকর্মী নন সাহিত্যিক৷ ... প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে তিনি অসহায়তার জটাজাল থেকে নারীকে মুক্তির উপায় দেখাতে চেয়েছিলেন৷ (ঘোষ, ২০০৯, পৃ. ৪৯-৫০) লেখিকা সমাজ-সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন গল্পে নারীর নীরব প্রতিবাদ সরব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করে গেলেন৷ লেখিকা ভারতীকে দিয়ে নতুন বাসায় পুরানো সংসার পাতালেন কিন্তু সম্পর্কের শিকড় উপড়ে দিলেন না৷ স্বামীর অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কাছে স্ত্রীর মাথা নত হতে দিলেন না৷ আবার দেখা-সাক্ষাৎ, কুশল বিনিময়, ডিনার ও মৃদু আলাপচারিতার মাধ্যমে লেখিকা বার্তা দিলেন যে, ভারতী শিক্ষিতা, আজকের নারী, তাই মুখ বুজে অপমান সে সইবে না৷ লেখিকা ভারতীর বান্ধবীর মুখ দিয়েও প্রত্যায়িত করালেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মের যুগ চলে গেছে বাবা, দেখ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ?' (দেবী, ১৪০৭, পৃ. ১০১) ''আশাপূর্ণা দেবী দেখেছেন মানুষ কত অসহায়, কেবল পরিবেশের কাছে নয়, সমাজের কাছে নয়, নিজের চিত্তবৃত্তের কাছেও৷ এই নব্য আধুনিক সমাজের এত জাঁকজমকের ভেতর কোথায় বেশ একটা বড় ফাঁকি আছে, যা সহজে চোখে পড়ে না — তিলে তিলে নিঃশেষ করে৷ এই অসহিষ্ণুতা — ঔদাসীন্য তাঁর ভাবনায় একটা নিরন্তর ঘটে যেতে থাকা দ্বন্দ্বের টুকরো প্রকাশ, এই বহমানতাকে প্রকাশরূপ দিতে পেরেছিলেন বলেই আশাপূর্ণা প্রায় অর্ধশতকের পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছেন অনায়াসে৷'' (রায়, ২০০৯, পৃ. ৪৪)

আশাপূর্ণা দেবী কোন কোন গল্পে গৃহবধূকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, প্রাথমিকভাবে মনে হবে সে সত্যই সমাজ-সংসারের চোখে অপরাধী৷ আসলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধ্যান-ধারণা ও মুরুব্বিদের মতামতকে পাশে রেখেই প্রতিবাদী নারীর চরিত্রটি এঁকে গেছেন লেখিকা৷ যেমন 'অনাচার' গল্পে সুভাষ কাকিমাকে প্রাথমিকভাবে চরম অনাচারী বলেই মনে হয়৷ স্বামীর মৃত্যুসংবাদ সাত মাস চেপে রেখে বিধবা হয়েও সধবার আচরণ ঘোরতর অপরাধ৷ সতীদাহ, বাল্যবিবাহের দেশে গৃহবধূর বিধবা হয়েও সধবার আচার-আচরণ করাটাতো নারী হিসাবে চরম অপরাধ! কিন্তু সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্নেহময়ী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী গৃহবধূ সুভাষ কাকীমাকে যুগোত্তীর্ণা আধুনিকা গৃহবধূরূপে ভাবতে পারে না কেন সমাজ ? যে শ্বশুর মশাই ছেলে বোম্বে চলে যাবার কারণে বৌমাকে কটূ কথা শোনায়, কারণে অকারণে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে সেই অতিবৃদ্ধ শ্বশুর মশাইকে ছেলের মৃত্যুর খবর দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে শেষ আঘাত দিতে চাননি সুভাষ কাকীমা৷ আবার শ্বশুর মশাইয়ের মৃত্যুর দিনেই পাড়ার সমস্ত মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সামনে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যুক্ত চিঠি তুলে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কি করতে হবে শুনে নিতে চেয়েছে অনাচারী বৌমা৷ পাড়ার কোন ভদ্রলোকই ভদ্রতা দেখিয়ে সুভাষ কাকীমার উদার, স্নেহময়ী, ত্যাগী ও দুঃখী মনের খবর নিতে চাননি৷ এরকম ভদ্রলোকী সমাজে সুভাষ কাকীমার মত বলিষ্ঠ নারীসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করে আশাপূর্ণা বুঝিয়ে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্র হোক আর সংসার ক্ষেত্র কঠোরতায়, দীপ্ততায়, সেবায় ও ত্যাগে নারী অগ্রণী ভূমিকাই

পালন করে৷ আশাপূর্ণা অন্যত্র বলেছেন, ‘‘শিল্পী মাত্রেই নিজস্ব মনোভঙ্গীর অনুকূলে তার শিল্পের উপকরণ বেছে নেয়৷ আমার বেছে নেওয়া উপকরণ হচ্ছে — সাধারণ সমাজবদ্ধ ঘরোয়া মানুষ৷ নিতান্তই সাধারণ, সে সাধারণেরা শুধু প্রাণপাত করে দিনের ঋণ শোধ করে চলে৷ যে মানুষ তার প্রতিকূল পরিবেশ ভাঙছে, গুড়োচ্ছে, মোচড়াচ্ছে, বিকৃত করে ছাড়ছে তার অপরিতৃপ্ত দুঃসাধ্য বাসনা প্রতিপদে দীর্ণ-বিদীর্ণ করছে, আর সেই বিদীর্ণ অস্তিত্বের অন্তরালে অবস্থিত এক অমৃত পিপাসু আত্মা জর্জরিত বেদনায় ক্রন্দন করছে৷’’ (দেবী, ২০০৯, পৃ. ২৪৭) সুভাষ কাকিমা প্রতিকূল পরিবেশে দুঃসাধ্য বাসনা পূরণ করে চরম সমালোচিত হয়েছে কিন্তু তার অন্তরের কান্না কেউ দেখতে পায়নি — আশাপূর্ণা নারীজীবনের এই না দেখা জীবনের সন্ধান দিয়েছেন তাঁর গল্পে৷

নারী জন্মদাতৃ, নারী সৃষ্টির আধার, নারী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে যুগে যুগে নানা রূপে সমাজে বন্দিত হয়ে আসছে৷ বন্দনার সঙ্গে গঞ্জনাও কম শুনতে হয় না নারী সমাজকে৷ দায়িত্ব নিয়ে, স্বাধীনভাবে সংসারের হিতসাধনে নারীর অবদানকে সমাজ বক্র চোখে দেখে; সন্তান পালনে সফল না হলে বক্রবাণে জর্জরিত হতে হয় নারীকেই৷ সার্বিক সফলতাপ্রাপ্ত নারীকে আবার তারাই প্রশংসা করে যারা এতদিন কুচোখে দেখে কুকথায় মুখর হয়েছিল৷ আশাপূর্ণাদেবী বলেছেন, ‘‘এই জানা জগতের মধ্যেই রয়েছে অনন্ত অজানা রহস্য, অনুভব করেছি মানুষের যতটুকু দেখা যায় সেইটুকুই তার সব নয়, যেটা দেখা যায় না সেটা অনেকখানি, সেই অনেকটাই তার জীবন আর জিজ্ঞাসার নিরন্তর দ্বন্দ্ব৷ কারণ সে জানে না, সে শুধু তার পরিবেশের কাছেই অসহায় নয়, অসহায় আপন চিত্তবৃত্তির কাছেও৷ জানে না তার অবচেতন সত্তা কীভাবে তার চেতন সত্তাকে পরিচালিত করে চলে, জানে না মাকড়সার মতই সে অবিরত নিজেকে ঘিরে জাল রচনা করে নিজেকেই বন্দী করে চলেছে৷’’ (দেবী, ২০০৯, পৃ. ২৪৭)

আশাপূর্ণার এরকমই একটি গল্প ‘ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ’৷ বুলা নামে এক গৃহবধূর অসাধ্য সাধনের গল্প এটি৷ গল্পে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও পরোক্ষে তার সংগ্রামের কথাই বর্ণিত হয়েছে৷ ব্যক্তি পরিচয়ে বুলা অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারী কর্মচারী রাজেনবাবুর ছোট ছেলের বৌ৷ তার উদাসীন ছোট ছেলেকে সংসার মুখো করার জন্য বুলার সাথে বিবাহ হয়৷ প্রথম দিকে স্বামী সুখেনকে বশে আনতে পেরেছে বলে দুর্ণাম রটে, আবার বুলাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাকেই অপবাদ শুনতে হয়, স্ত্রী হয়ে স্বামীকে ধরে রাখতে পারেনি বলে৷ স্বামী ছেড়ে চলে যাবার পর অসহায়তায় কান্নার পর্ব অতিক্রম করে বুলা সংসারের হাল ধরে৷ নিজের গয়না বিক্রি করে সংসার চালায়৷ তারপর সংসারকে বাঁচাতে কাউকে না জানিয়ে পাশের বাড়ির লেখক বিজুর হাত ধরে অভিনয় জগতে প্রবেশ করে৷ বুলার অবর্তমানে অভাব অনটনে সংসার অসার হয়ে ওঠে৷ সকলে তার মুণ্ডপাত করতে থাকে৷ অর্থের অভাবে রাজেনবাবু ঘর ভাড়া দিতে পারে না, ভাতেও টান পড়ে৷ এমতাবস্থায় রেজেষ্ট্রি ডাকে বুলার পাঠানো টাকা পরিবারের হস্তগত হয়৷ এরপর পরিবারের চরিত্রের রঙ মুহূর্তেই বদলে যায়৷ যাকে কুলটা অপবাদ দিয়েছিল, যার জন্য তাদের মাথা কাটা যাচ্ছিল অপমানে, তারাই বুলার পাঠানো টাকায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে৷

বাড়িওয়ালার মেয়ে রানুর কাছে পাঠানো বুলার চিঠি যে রাজেনবাবু সদর্পে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিল, সেই রাজেনবাবুর পরিবারই বুলার পাঠানো টাকা পেয়ে গিরগিটির চেয়েও অল্প সময়ে রঙ বদলে ফেলে৷ যে বাড়ির ছেলে পরিবারের দায়িত্ব পালন না করে যৌবনবতী স্ত্রীকে ছেড়ে কাপুরুষের মত সন্ন্যাসী হয়ে যায় সেই বাড়িরই ভবিষ্যতের কথা ভেবে অপবাদ মাথায় নিয়ে বুলা রোজগার করতে বেরিয়ে

পড়ে৷ গৃহবধূও যে দায়িত্ব নিয়ে ঘরে ও বাইরে সফলভাবে কিছু করতে পারে লেখিকা বুলার চরিত্রের মধ্যে তা দেখিয়েছেন৷ কিন্তু সমাজ-সংসারে প্রিয়জনেরা বুলার মত গৃহবধূকে কি দিয়েছে ? অপবাদ, অপযশ, অবহেলা ও অপমান৷ সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা ভেবে বুলা ঝড়ের মত বেরিয়ে গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সংসারের কথা ভেবে একেবারে অভিনয় জগতে প্রবেশ করে বিদ্যুতের মত সকলকে চমকে দিয়েছে এবং বৃষ্টির মত সৃষ্টি ক্ষমতা নিয়ে অসময়ে টাকা পাঠিয়ে সংসারকে বাঁচিয়েছে৷ গৃহবধূও যে সংগ্রাম করে সংসারের হাল ধরতে পারে বুলার মত নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই নীরব প্রতিবাদের সরব কাহিনি লেখিকা পরিবেশন করেছেন৷

নারী জীবনের অন্তর্লোকের সন্ধান পাওয়া যাবে আশাপূর্ণার ছোটগল্পে৷ সংসারের অভ্যন্তরে মেয়েদের দায়িত্ব-কর্তব্য, সাফল্য-ব্যর্থতা, বেদনা-হতাশা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, বিধিনিষেধ, প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি দিক সুনিপুণ চিত্রাঙ্কনে তিনি দক্ষ শিল্পী৷ নারীর অন্দরমহল, পরিবার ও সংসারবৃত্তে নারীর মনোজগতে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত নারী মননের অবস্থাকে সঠিকভাবে পুরুষ লেখকদের রচনায় প্রতিফলিত হয়নি যেমন করে প্রতিফলিত হয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যে৷ চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের মতই স্ত্রীর পথ নয়, পুরুষের গড়ে দেওয়া সীমানাই নারীর পরিসর নয়৷ নারীর দৈহিক গঠন যেমন পৃথক, নারীর জগৎ যেমন আলাদা, তেমনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেও নারীর পৃথক কণ্ঠস্বর আছে৷ সেই চাপা পড়া কণ্ঠস্বরকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মূর্ত করেছেন আশাপূর্ণা দেবী৷

তথ্যসূত্র:

১। বসু. নি. (২০০৯), 'আশাপূর্ণা দেবীর উপলব্ধির জগৎ', প্রবন্ধ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা (জানুয়ারী-এপ্রিল), আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পা. ভৌমিক. তা., দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা - ৫৯।

২। চক্রবর্তী. ম. (২০০৯), 'অন্দরচারিণীর অন্তরচারণ', প্রবন্ধ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা (জানুয়ারী-এপ্রিল), আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পা. ভৌমিক. তা., দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা - ৫৯।

৩। বসু মিশ্র. ক. (২০০৯), 'অন্তরঙ্গ আশাপূর্ণা', কোরক সাহিত্য পত্রিকা (জানুয়ারী-এপ্রিল), আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পা. ভৌমিক. তা., দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা - ৫৯।

৪। দাশ. শ. (২০০৯), 'ছোটদের জন্য লিখেই সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলাম', সাক্ষাৎকার : কোরক সাহিত্য পত্রিকা (জানুয়ারী-এপ্রিল), আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পা. ভৌমিক. তা., দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা - ৫৯।

৫। চট্টোপাধ্যায়. হী. (২০০৯), 'আশাপূর্ণা দেবী', প্রবন্ধ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা (জানুয়ারী-এপ্রিল), আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পা. ভৌমিক. তা., দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা - ৫৯।

৬। দেবী. আ. (১৪০৭), বাছাই গল্প (একাদশ মুদ্রণ), মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা - ৯।

৭। ঘোষ. সু. (২০০৯), 'আশাপূর্ণার সপ্তপর্ণী', প্রবন্ধ, আরাত্রিক, শতবর্ষে আশাপূর্ণা (ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা), সম্পা. মিদ্যা. দু. ২৪ / ৬৬ নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ০৮।

৮। রায়. তা. (২০০৯), 'বাংলা সাহিত্যে পুরুষ পরিসর ছাপিয়ে নারীশক্তি উদ্বোধনের প্রামাণ্য প্রকাশ আশাপূর্ণা দেবী', প্রবন্ধ, আরাত্রিক, শতবর্ষে আশাপূর্ণা (ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা), সম্পা. মিদ্যা. দু. ২৪ / ৬৬ নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ০৮।

৯। দেবী. আ. (২০০৯), 'আমার সাহিত্য চিন্তা', কোরক সাহিত্য পত্রিকা (জানুয়ারী-এপ্রিল), আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পা. ভৌমিক. তা., দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা - ৫৯।